ডমরু-চরিত

গল্প # ১

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র:

*ডমরুধর

*শঙ্কর

*লম্বোদর

*পবন

(ঢাকের আওয়াজ ক্রমে মদু হয়)

ডমরুধর - এই তো সকলেই এসে গেছে দেখছি। তা লম্বোদরকে দেখছি না?

শঙ্কর - ওই তো অঞ্জলি দিচ্ছে। তা এবার পূজোর আয়োজন একটু কম কম মনে হচ্ছে, ডমরুবাবু?

ডমরুধর - আমার বাড়ির পুজো বলে একে অবজ্ঞা কোরো না। তোমাদের মত বাবুদের তো ভাল-মন্দ বোধই নেই...এই যে বাবা লম্বোদর, তা অঞ্জলি দিলে?

লম্বোদর – হ্যা, দিলাম।

ডমরুধর- তা বেশ, বেশ, হ্যা হ্যা, ওখানটায় বস, আরাম করে বস।........তা যা বলছিলাম...বাবুরা এখন সব হাওয়াখোর হয়েছেন, যেন গ্রাম-দেশে হাওয়া নেই, তাই বিদেশে গিয়ে বাবুরা হাওয়া খান। আর বাপ-ঠার্কুদার পূজোর দালান ছুচো-চামচিকেতে নোংরা করে।

লম্বোদর - এক্কেবারে হক কথা। আগে লোকেরা পূজোর সময় বিদেশ থেকে বাড়ি আসত, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করত, যার যেমন ক্ষমতা মায়ের পূজো দিত। গরিব দুঃখিরা অন্তত একটু খই মুড়কি আর দুটো করে নারকেল নাড়ু পেত।

শঙ্কর - শুনেছি এখন নাকি কলকাতায় এক নতুন ব্যাবসা হয়েছে।পূজো ব্যাবসা!! একটা প্রতিমা খাড়া করে লোকজন নেমন্তন্ন করে, পরে তাদের কান মলে প্রনামি আদায় করে।পূজো করে আজকাল নাকি অনেকে বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে।

ডমরুধর – তোমাদের এই সবেতে দোষ ধরার অভ্যাসটা মোটেও ভাল নয় হে। আমিও তো বাপু পূজোর সময় আমার প্রজাদের নেমন্তন্ন করি। আর ভক্তিভরে, মায়ের পাদপদ্মে, কেউ যদি কিছু প্রনামি দেয়, আর সেই প্রনামি যদি আমি আমার ট্যাঁকে গুজি, তাতে দোষ ধরার কি আছে শুনি?

পবন – কিচ্ছু নেই।

ডমরুধর – পূজোর তো একটা খরচ আছে রে, বাবা। তবে সত্যি কথা বলতে কি, (খাটো গলায়) সে খরচ আমার উঠে আসে.... এই তোমরা বলেই বলছি.... কথাটা পাঁচ কান কোরো না.....এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি যে, মায়ের আরাধনায় ধনযোগ করলে ধনলাভই হয়।

পবন – যা বলেছেন.... সেই সংস্কৃতে শ্লোক আছে না...তে সন্মতা...জনপদেষু...ধনানি...

শঙ্কর - থাক থাক, অনেক হয়েছে। তোমায় আর অত শ্লোক ঝাড়তে হবে না। তা সোজা করে বললেই হয় যে এই পূজো করেই আপনার এত বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে ডমরুবাবু ।

ডমরুধর – তোমাদের এই সবেতে বেশি, বেশি। আগেও লম্বা পাঁচ ফুট দুই ছিলাম, এখনো তাই। প্রস্হে বলতে পারো কিছুটা বাড়ন্ত....

লম্বোদর – আরে না না, আপনি বেঁটে না মোটা সেকথা হচ্ছে না; হচ্ছে আপনার টাকার কথা। আপনার অবস্থা, মানে অর্থনৈতিক অবস্থা আগে নাকি খুবই খারাপ ছিল।

পবন - হ্যা হ্যা। আমিও শুনেছি বটে যে আপনি অনেক কৌশল করে, একটিও পয়সা খরচ না করে এখন বড়লোক হয়েছেন। আর এখন সুন্দরবনে এই আবাদ করে দিন দিন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন।

ডমরুধর - তাহলে তোমাদের আমার পূর্বকাহিনিটা বলি, কি বল- অ্যাঁ? এতে সব সংশয় দূর হবে।

শঙ্কর - পূর্বকাহিনি ?

ডমরুধর – হ্যাঁ আমার বড়লোক হওয়ার পূর্বকাহিনি, মানে ধর ঐ আমার আত্ম জীবনি। আজ যদি কৃত্তিবাস বা কাশীরাম থাকতেন, তা হলে তারা আমার বুদ্ধি, বীরত্ব আর কীর্তি-কাহিনি নিয়ে ছড়া বাধতেন, আর লোকে তা ঘরে ঘরে পাঠ করে কেতার্থ হত। তেনারা যখন নেই...

লম্বোদর - এই তো সেদিন ট্রেনে যেতে যেতে শুনছিলাম...কে নাকি একজন মাইকেল ছিলেন, আবার কে একজন নাকি তার জীবনী লিখেছিলেন। তা তাকে বললে তিনি তো আপনার জীবন-চরিত লিখতে পারেন।

ডমরুধর - তাহলে তার খোজ লাগাও দেখি। এ বছর আমার বাগানে অনেক কাচকলা হয়েছে, কিন্তু খদ্দের নেই তেমন। তা তিনি যদি আমার জীবন-চরিতটা লিখে দেন তাহলে আমি হাজারখানেক কাচকলা দিতে রাজি আছি।

পবন – কাচকলার বদলে জীবন-চরিত!

শঙ্কর - তাহলে জীবন-চরিতও ওই কাচকলার মতই হবে।

লম্বোদর – আরে তুমি থামো তো? ডমরুবাবু আপনি গল্পটা মানে ঐ পূর্বকাহিনিটা বলুন তো।

ডমরুধর – তা শুনতেই যখন চাইছো তখন শোন। আমি যখন ছোট, আমার বাবা এক জমিদারের কাছারিতে মুহুরির কাজ করতেন। মাইনে ছিল সামান্য।

লম্বোদর – তাতে সংসার চলত ?

ডমরুধর – কোনক্রমে চলত, এই আর কি। তা মা-বাবা গত হবার পর আমি পড়লাম অগাধ জলে। তারপর এ ঘাট সে ঘাটের জল খেতে খেতে অবশেষে কাজ জুটল কলকাতায় বড়বাজারে হর ঘোষের কাপড়ের দোকানে।

শঙ্কর – মাইনে কত?

ডমরুধর – পাঁচ টাকা, আর সঙ্গে ছিল খাওয়া।

পবন – আর থাকার ব্যবস্হা?

ডমরুধর – যে বাড়িতে বাবুর বাসা ছিল, তারই সিড়ির নিচে এক স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে জুটল আশ্রয়। বাবুর এক চাকরানী ছাড়া আর অন্য চাকর ছিল না। আমার আর সেই চাকরানীর জন্য গিন্নিমা স্বয়ং রান্না করতেন। সে এক অসাধারণ রান্না।

শঙ্কর - বা-বা! কর্মচারী আর চাকরানীর জন্য আসাধারন রান্না। আপনার গল্পে বেশ নতুনত্ব আছে দেখছি।

ডমরুধর – আরে শোনই না। সাধারন নয় বলেই অসাধারন।
পবন – সে আবার কেমন?

ডমরুধর – এই ধর গিয়ে, মুসুর ডালটি কেবল একটু হলুদ রঙের দেখতে হত, কিন্তু ডালের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল কিনা সন্দেহ। আর গিন্নি মা যে কি করে ঐ অভ্রের চেয়েও অমন পাতলা করে বেগুন কাটতেন যে কি বলব ! বাজারে যে চিংড়িমাছ বিক্রি হত না, যেগুলো লাল হয়ে প্রায় পচে যেত, যার গন্ধে লোকে নাকে কাপড় চাপা দিত, কালেভদ্রে সেই চিংড়িমাছ আসত।

শঙ্কর – সেই পচা চিংড়ি আপনারা খেতেন?

ডমরুধর – বাবু ও তার গিন্নি সেই মাছের ধড়গুলো খেতেন আর তার মাথাগুলো দিয়ে আমাদের জন্য ঝাল রান্না হত। যেদিন হত, সেদিন আমাদের আর আহ্লাদের সীমা থাকত না, বুঝলে। সেই পচা চিংড়ির মাথা আমরা অমৃত জ্ঞানে খেতাম, দুবার করে ভাত চেয়ে খেতাম। কিছুদিন পরে অবশ্যি বেশী ভাত খরচ হত বলে চিংড়ি আসা বন্ধ হয়ে গেছিল।

লম্বোদর – তখন কি শুধু ভাত'ই খেতেন?

ডমরুধর – না। তখন ট্যাঁকে একগাঁট তেঁতুল নিয়ে বসতাম, আর কোন মতে তাই দিয়ে ভাত উদরস্থ করতাম। যাই হোক ওই বাড়িতে থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, সেই শিক্ষাই আজ আমাকে বড়লোক করেছে।

পবন - কি শিক্ষা?

ডমরুধর - আমি বুঝেছিলাম যে টাকা রোজগার করলেই জমে না, টাকা খরচ না করলেই জমে।

পবন - তা সে শিক্ষা পেয়ে আপনি বড়লোক হলেন কিভাবে? আমিও তো তেমন খরচ করি না, কিন্তু বড়লোক তো হচ্ছি না।

শঙ্কর – সৎপথে ওসব হয় না পবনবাবু। একটু বাকা পথের আশ্রয় না নিলে...

ডমরুধর - তুমি থামো তো শঙ্কর। সবতাতেই তোমার এই ফোড়ন কাটা...

লম্বোদর - আহা আপনি আবার চটেন কেন? শঙ্কর একটু বাকা বাকা কথা বলে তা তো আপনি জানেন। কাজেই ওসব বাজে কথায় কান না দিয়ে আসল কাহিনিটা শুরু করুন দেখি।

ডমরুধর - হ্যা যা বলছিলাম, সবই মা ভবানীর কৃপা, নইলে আর আমার পাশের বাড়িটি আমারই এক স্বজাতি ভাড়া নেবে কেন?

পবন - বেশ জমাটি গপ্পের গন্ধ পাচ্ছি। স্বজাতিটি কে?

ডমরুধর - নাম প্রকাশ সেন। তিনি নিজে পুরো পাশের বাড়িটি ভাড়া নিলেন। আবার সে বাড়ীর নিচ তলাটা তিনি গোলক দে নামে অন্য আর এক ভদ্রলোককে ভাড়া দিলেন । গোলকবাবু এক সরকারি অফিসে কেরানিগিরি করতেন। ওনার ছেলে আবার পশ্চিমে কোথায় বেশ বড় মাইনের চাকরি করতেন।কলকাতায় কেবল থাকতেন গোলকবাবু ও তার স্ত্রী।

লম্বোদর – তা প্রকাশ সেন তাহলে কোথায় থাকতেন?

ডমরুধর – তিনি থাকতেন দোতলায়, সপরিবারে । প্রকাশবাবু এক সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন... তা ওনার অবস্থা মন্দ ছিল না, তবে টাকাকড়ি বা গয়নাগাটি বিশেষ ছিল না। প্রকাশবাবুর পরিবার বলতে ওনার স্ত্রী, মা, এক বিধবা বোন, দুটি ছোট ছেলে আর... এক মেয়ে।

পবন - মেয়ে? তার বয়স কত? দেখতে কেমন ? তার কি বিয়ে...

ডমরুধর - দাঁড়াও দাঁড়াও, মেয়ে শুনেই যে আর তর সইছেনা দেখছি।... ধীরে বৎস ধীরে। তা ওই সময়ে মেয়েটির বয়স তা ধর আঠারো-উনিশ। আমি যখন প্রথম মেয়েটিকে দেখলাম... কে যেন আমার কানে কানে বলে দিল...বাবা ডমরুধর! তোমার জন্যিই বিধাতা একে সৃষ্টি করেছেন। এই কন্যাই হবে তোমার দ্বিতীয় পক্ষ।

শঙ্কর - দ্বিতীয় পক্ষ মানে? তখন আপনার আরো এক পত্নী ছিলেন নাকি?

ডমরুধর - আরে না না। তোমাদের বলতেই ভুলে গেছি যে আমার বাবা মায়ের জীবিত অবস্থাতেই আমার প্রথম বিয়ে হয়েছিল। মা-বাবা গত হবার পরপরই আমার প্রথম স্ত্রীর

মৃত্যু হয়। তখন আমার বয়স ছিল পচিশ।তারপর দশ বছর আমার আর বিয়ে হয় নি। আমার যা অবস্থা ছিল তা তো আগেই বলেছি। আর আমার রুপ তো জানই তোমরা।

শঙ্কর – হ্যাঁ পাঁচ ফুট দুই, বিধবা, তায় আবার প্রস্হে বাড়ন্ত...

ডমরুধর – হ্যা...তাছাড়া বয়সও হয়েছিল, লোকে বিয়ে দেবেই বা কেন?

লম্বোদর - তা আপনি কি মেয়েটির বাবার কাছে মানে প্রকাশবাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন?

ডমরুধর - ওহে না। বলেইছি তো, বয়স তখন আমার পয়ত্রিশ, তার ওপর অবস্থাও করুন, কাজেই বিয়ের প্রস্তাব করলে প্রকাশবাবু হেসেই উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু বিধাতা বিধান কে খন্ডাতে পারে?

পবন - এত হেয়ালি করে কথা বলেন কেন? কি হল, তাড়াতাড়ি বলুন না, আমার যে আর তর সইছে না।

ডমরুধর - কি আবার হবে? মেয়েটি হঠাৎ নিদারুন রোগে আক্রান্ত হল!

শঙ্কর - গলায় এত খুশির ছোয়া দিয়ে বলছেন যে মনে হচ্ছে তাতে আপনার সুবিধেই হয়েছিল।

ডমরুধর - না, তা নয়! আসলে এই সূত্রে পাশের বাড়িতে আমার যাতায়াত একটু বাড়ল আর কি। আর প্রকাশবাবুকে এবেলা ওবেলা 'আপনার মেয়ে কেমন আছে?' একথা বলার সুযোগ ঘটল।

পবন- বোঝো!

ডমরুধর - ক্রমে ক্রমে তাদের জন্য টুক টাক কাজকর্মও করে দিতে লাগলাম। মানে এই ওষুধ এনে দিতাম, কি ডাক্তার বাড়ি যেতাম। এমনকি নি...জে...র পয়সায় বড়বাজার থেকে দু-একবার ছাড়ানো বেদানাও এনে দিয়েছিলাম।

লম্বোদর -ছাড়ানো বেদানা!!

ডমরুধর –হ্যাঁ; এই সব করে প্রকাশবাবুর সঙ্গে আমার খানিকটা ভাব জমে গেল।

শঙ্কর –হ্যাঁ ....মেয়ের বাপকে হাত করা তো আগে দরকার বটেই!

ডমরুধর - মেয়েটির রুপ ছিল না বটে, কিন্তু তাকে দেখে আমার মন এমন মোহিত হয়ে গেল যে আর কি বলব। প্রকাশবাবুর থেকে জানতে পারলাম তার আদুরে মেয়েটির নাম মালতী। কেমন সুন্দর নাম দেখেছ? মা---লো----তী!! নামের মধ্যে বেশ একটা...বেশ একটা ইয়ে ইয়ে ভাব আছে না? আহা...হা..হা... শুনলেই কেমন যেন কান জুড়ায়।

পবন - সত্যিই কেমন যেন বুকটা জুড়িয়ে গেল...আহা...হা কি মিষ্টি নাম।

শঙ্কর - থাক থাক, তোমায় আর ডেপোমি করতে হবে না।

ডমরুধর - আহা...ও ছেলেমানুষ, ওকে বোকো না। কচি বয়সে অমন মিষ্টি নাম শুনলে বুকের মধ্যে ওরকম একটু হু হু করে ওঠাটাই স্বাভাবিক। হ্যা... তা যা বলছিলাম...ভগবানের কৃপায় মালতী আরোগ্যলাভ করল। আর ইতিমধ্যে আমি তাদের ঝিকে মাঝে মাঝে দু-একটা সন্দেশ, দু-একটা রসগোল্লা কি দু-একটা জিলিপি দিয়ে বেশ হাত করে ফেলেছিলাম।

শঙ্কর- মেয়ের বাপকে হাত করাতো বুঝলাম, তা ঝিকে হাত করার কারনটা কি?

ডমরুধর - তার মাধ্যমেই বিয়ের কথাটা পাড়লাম আর কি। প্রকাশবাবুর মা, স্ত্রী ও সেই বিধবা বোনের কানে তুললাম মনের ইচ্ছেটুকু। তা জানোই তো বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। সেই বিধবা বোন বেঁকে বসলে।

পবন – তার বুঝি আপনাকে পছন্দ?

ডমরুধর – আরে না। ক্ষেপেছো নাকি, সে বিধবা বোনের বয়স তিন কুড়ি আর মাথা, পদি পিসির থেকেও গরম। বিয়ের কথা শুনে সে হেসেই উড়িয়ে দিলে।

লম্বোদর - হেসেই উড়িয়ে দিলে?

ডমরুধর - শুধু কি তাই। আরও বল্লে যে 'কি... ওই বুড়ো, জংলা ভূতটার সঙ্গে মালতীর বিয়ে দেব? পোড়া কপাল'। আরও কি কি সব যেন বলেছিল, সেসব আমার এখন ঠিক মনে নেই।

শঙ্কর - মনে নেই, নাকি বলতে লজ্জা হচ্ছে? যাগগে যাক, তাহলে আপনার সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল বলুন?

ডমরুধর - না ঠিক তা নয়। আসলে, ঐ মেয়ের বাপকে হাত করাটা কাজে লেগে গ্যালো। প্রকাশবাবু আমার প্রস্তাবটি একেবারে উড়িয়ে দেন নি। তিনি বরং বাড়িতে বুঝিয়েছিলেন যে পুরুষ মানুষের পক্ষে পয়ত্রিশ বছর বয়স তেমন বেশী নয়, বরঞ্চ বেশ কচি'ই। আর রুপে কিই বা যায় আসে, গুনটাই আসল। তার উপরে মালতীর অসুখের সময় আমি যা করেছিলাম তাতে তার ধারনা হয়েছিল যে আমি লোকটা মন্দ না। তার শুধু একটিই চিন্তা ছিল যে আমি সামান্য বেতনে কাপড়ের দোকানে কাজ করি, সংসার চালাব কি করে?

পবন - তা উনি রাজি হলেন?

ডমরুধর - তা সহজে কি আর হন। একটু কায়দা করতে হয়েছিল আর কি।

লম্বোদর - আবার কি কায়দা?

ডমরুধর - তেমন কিছু নয়। তবে ঝিকে শুধু আগে থেকে কিছু জিনিস শিখিয়ে রেখেছিলাম। কাজেই আমার অবস্থার কথা যখন উঠল তখন ঝি বলল যে -'দেশ গাঁয়ে ডমরুবাবুর একর একর দোফসলা জমি আর হাজারো আম, কাঁঠাল আর নারকেল বাগান আছে'। এই তোমরা বলেই বলছি.... কথাটা পাঁচ কান কোরো না........ এসব আমারই শেখানো কথা, কারণ এ সবই মিথ্যে ছিল।....

লম্বোদর - তা ওসব মিথ্যে কথায় কাজ হল?

ডমরুধর - মালতীর বাবা, মা ও পিতামহী একপ্রকার রাজি হল। কিন্তু বাদ সাধল ওই বিধবা বোন। এই কারনেই মাঝে মাঝে ভাবি সতীদাহ প্রথাটা তেমন মন্দ ছিল না। তাহলে ওই বিধবা বোনটা আজ... তা যাগগে ওসব কথা..... যাই হোক শেষমেষ তিনি বললেন যে 'হবু জামাই এর যদি এত সম্পত্তি থাকে, তাহলে বিয়ের সময় মেয়েকে অন্তত পাঁচশ টাকার গয়না দিতে হবে।'

শঙ্কর - তার মানে প্রকাশবাবুর বিধবা বোন আপনাকে বেধড়ক প্যাঁচে ফেলেছিল দেখছি।

ডমরুধর - তা ফেলেছিল বটে। আমার তো পাঁচশ টাকার গয়না শুনেই আক্কেল গুড়ুম।পাঁচশ টাকা দূরে থাক আমার তখন পঞ্চাশ পয়সাও ট্যাকে ছিল না।

পবন - ইস! (চুক চুক) তাহলে আপনার আর বিয়েটা হল না বুঝি?

ডমরুধর - আরে আগে শোন তো সবটা। কথায় বলে না, রাখে হরি মারে কে। আমাকেও হরি রাখলেন আর কি। আর মালতী বড় পয়মন্ত মেয়ে। কারণ ঠিক সেই সময় হঠাৎ আমার কপাল খুলে গেল।

লম্বোদর - কিভাবে?

ডমরুধর - এক অভাবনীয় ঘটনায় আমার হাতে হাজার দেড়েক টাকা এসে গেল। আমার আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রইল না। কিন্তু এ কথা আমি কাক পক্ষীকেও টের পেতে দিলাম না। ওই টাকা নিয়ে চুপি চুপি আমি আমার গ্রামে গেলাম। তেরশ টাকা এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখলাম আর দুশ টাকা নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসলাম।

পবন - সত্যি কপাল বটে আপনার!

শঙ্কর - আরে কপাল না হাতি। শুনলে না টাকাটা নিয়ে কেমন চুপি চুপি গ্রামে গেছিলেন। আমি কেমন যেন এর মধ্যে একটা অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি...

ডমরুধর - আরে বাবা থামো তো। তোমার সবতাতেই একটা ফোড়ন দেওয়া চাই। হ্যা... যা বলছিলাম। তো কলকাতায় ফিরেই আমি প্রকাশবাবুর মেয়েকে পাঁচশ টাকার গয়না দিতে রাজি হলাম। ব্যাস শুরু হয়ে গেল বিয়ের আয়োজন। আমার কথামত আমি বিয়ের দিন সন্ধ্যাতেই পাঁচশ টাকার গয়না পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়েটা বেশ ধুমধাম করেই হল। আর বিয়েতে আর কোন গোলমালও ঘটে নি। এখানে একটা কথা অবশ্য না বললে অন্যায় হবে... .... এই তোমরা বলেই বলছি.... কথাটা পাঁচ কান কোরো না........ওই পাঁচশ টাকার গয়না আমি মাত্র একশ টাকায় কিনেছিলাম.. গিল্টি করা দু নম্বরি মাল।

শঙ্কর - আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম, যে আপনি একটা কিছু গোল করেছেন...

লম্বোদর - আরে তুমি থামত। তারপর?

ডমরুধর - তারপর আর কি...বিয়ের পর ছমাস পরম সুখে কেটে গেল। আগেই তো বলেছি যে শ্বশুরবাড়ি তো আমার কাছেই, এক্কেবারে পাশের বাড়ী। কাজে কাজেই সেখানে সবসময়ই আমার নেমন্তন্ন থাকত। আমার আদরের সীমা ছিল না, এই এটা খাও, ওটা খাও... শরীরে বেশ একটা জেল্লা এসে গেছিল, বুঝলে কি না।

পবন – খুব বুঝছি; সত্যি কপাল করে শ্বশুরবাড়ি পেয়েছিলেন।

ডমরুধর - কিন্তু চিরদিন কারো সমান যায় না হে। একদিন সকাল নটায় শ্বশুরবাড়িতে খেয়ে দেয়ে দোকানে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় নিচের তলায় ভয়ানক কোলাহল পড়ে গেল।

লম্বোদর- হল কি?

ডমরুধর - আমি তো আগেই বলেছি যে আমার শ্বশুরবাড়ির নিচে গোলকবাবুরা ভাড়া থাকতেন!

লম্বোদর- হ্যা?

ডমরুধর - আর ওনার ঘরটা ছিল ঠিক আমার ঘরের লাগোয়া..

পবন – আপনার ঘর মানে, কোন ঘর? শ্বশুরবাড়ির না পাশের বাড়ীর?

শঙ্কর - পাশের বাড়ীর ঘর... আচ্ছা ভোদাই... পাশের বাড়ী মানে ওনার মালিক হর ঘোষের বাড়ির নীচতলার যে ঘরে উনি বিয়ের আগে থেকে থাকতেন....

ডমরুধর – হ্যাঁ....মানে, হর ঘোষের বাড়ির সিঁড়ির নিচে যে ঘরে আমি থাকতাম আর তার পাশে আমার শ্বশুরবাড়ির নীচতলার যে ঘরে গোলকবাবুরা থাকতেন তা আলাদা করা ছিল একটি মাত্র দেয়াল দিয়ে। তা কোলাহলটা সেই গোলকবাবুর ঘরেই হচ্ছিল।

শঙ্কর - মানে...

লম্বোদর - আরে বাবা, বাগড়া না দিয়ে শুনতে দাও না ব্যাপারটা কি।

ডমরুধর - ব্যাপারটা তেমন কিছু না। কোলাহল শুনে আমিও দৌড়ে নিচে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার শ্বশুরমশায়ও সেখানে উপস্থিত। তার কাছে শুনলাম সেই মোহর কাহিনী!

সবাই(একত্রে) – মো-হ-র কাহিনী??

ডমরুধর – ব্যাপার হল যে গোলকবাবুর পুত্র নাকি মাঝে মাঝে বাবার কাছে টাকা পাঠাতেন। আর গোলকবাবু সেই টাকাগুলোকে মোহর করতেন। এরকম করে তিনি একশ মোহর সঞ্চয় করেছিলেন। তারপর তা থলি করে, তার ঘরে যে দেয়াল আলমারী আছে, তার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। আলমারীটির মধ্যে তক্তার খোপ ছিল। তার মধ্যেই তিনি ওই মোহরের থলি রেখেছিলেন। আর সেই আলমারীর কপাট ছিল কাঠের। গোলকবাবু তা সর্বদা তালা দিয়ে রাখতেন। এখন ঘটনা হয়েছে কি...গোলকবাবুর সেই মোহরের থলি চুরি গেছিল, তার জন্যই ওই গোলমাল।

শঙ্কর - আমার প্রথম থেকেই কেমন যেন একটা খটকা...(চুক চুক) মানে সন্দেহ... যাক...তারপর?

ডমরুধর - গোলকবাবুর ঘরে ঢুকে দেখি ওনার স্ত্রী মেঝেতে বসে বসে কাঁদছেন আর উনি খাটের উপর মনের দুঃখে নীরবে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করাতে উনি মোহর কবে চুরি গেছে তা বলতে পারলেন না, তবে এটুকু মনে করতে পারলেন যে তিনি বছরখানেক আগে মোহরগুলো আলমারীতে রেখেছিলেন। তারপর ওই দেয়াল আলমারী তিনি আর খুলে দেখেন নি।

শঙ্কর - তা ওই দেয়াল আলমারীর চাবি ছিল না।

ডমরুধর - ছিল। আর যেহেতু ওই চাবি ওনার কাছেই থাকে তাই তিনি কাওকে সন্দেহও করেন না। আমার শ্বশুরমশাই পুলিশে খবর দেবার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু আমি তাতে আপত্তি করলাম। আমি বললাম যে - 'কবে কখন চুরি গিয়েছে তারই ঠিক নেই, আর কারো উপর ওনার যখন সন্দেহ হয় না, তখন শুধু শুধু পুলিশে খবর দিয়ে কি হবে?' যাই হোক পুলিশে আর খবর দেওয়া হল না।

শংকর - তার মানে কি আপনিই ...

ডমরুধর – আঃ...তুমি আর এর মধ্যে মানে খুঁজো না। যাই হোক সন্ধ্যার পর যখন আমি দোকান থেকে ফিরে আসলাম, আমার শ্বশুরমশাই আমায় ডেকে পাঠালেন।

শংকর – কেন? কি বললেন?

ডমরুধর - বললেন যে- 'বড়ই বিপদ হয়েছে। গোলকবাবুর কাছে শুনলাম তোমার আর ওনার ঘর গায়ে গায়ে। মানে দুই ঘরের কড়ি একই দেয়ালের উপর। গোলকবাবুর যে ঘরে দেয়াল আলমারী সেই ঘরের দেয়ালও বড় পাতলা। আজ দুপুরে তিনি আলমারীটি ভাল করে অনুসন্ধান করছিলেন। ওই মোহরের থলি তিনি যে স্থানে রেখেছিলেন সেই স্থানের দেয়ালে হাত লাগা মাত্র সেখানকার দেয়াল ভেংগে যায়। তিনি ওই ভাংগা স্থান পরীক্ষা করে দেখেন তা বালি দিয়ে ভরাট করা ছিল। দুই ঘরের দেয়াল যেহেতু একই, কাজেই ওই ঘরের ফুটো তোমার ঘরেরও ফুটো। তাই তোমার উপর এখন তার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়েছে। তা তুমি যদি বাবা মোহরগুলি নিয়ে থাকো, তা হলে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দাও। তাহলে সবই মিটমাট হয়ে যাবে। না হলে বড়ই গোলমাল হবে বাবা।

শংকর - আমি তাহলে ঠিকই ধরেছিলাম যে আপনিই ওগুলো সরি....

ডমরুধর - আরে শোন না...শ্বশুরমশাই-এর ও কথা শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি বললাম-'সেকি মশাই ! আমি ভদ্রসন্তান, চোর নই। তার উপর আপনি আমার শ্বশুর। আমাকে অমন দোষারোপ করবেন না।' তারপর গোলকবাবু ও তার গিন্নীও আমায় অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু উল্টে আমিই তাদের উপরে অনেক চোটপাট দেখালাম।

পবন - তারপর?

ডমরুধর - কথাটা ঘুরে ফিরে আমার মনিব হর ঘোষের কানেও উঠল। তিনিও আমাকে মোহরগুলি ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমি তাকে সাফ বলে দিলাম-'দেখুন মশাই, আমি আপনার দোকানেও অনেক বছর কাজ করছি, আপনার বাড়িতেও আছি অনেকদিন, কখনো আপনার একটি পয়সাও নিয়েছি? আমার প্রতি সন্দেহ হয় এমন কাজ কি কখনো করেছি?'

লম্বোদর - আপনার সাহস আছে বলতে হবে। আচ্ছা টাকাটা কি সত্যি সত্যি আপনি ...

শংকর - এটাও কি তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে। সহসা কপাল কি কারো এমনি এমনি খোলে? আমার গোড়া থেকেই কেমন একটা সন্দেহ...

পবন - তা পুলিশে ধরলো বুঝি?

ডমরুধর - না, তা ধরলে না বটে, তবে এ নিয়ে দিনকয়েক খুব গোল চলল। মানুষ হাজার বুদ্ধিমান হোক, এরকম কাজে একটা না একটা ভুল করেই ফেলে। আমিও তাই করেছিলাম। এসব অনেক দিনের কথা, এখন আর প্রকাশ করতে আপত্তি নেই। তবু সাবধানের মার নেই.... এই তোমরা বলেই বলছি.... কথাটা পাঁচ কান কোরো না.....

শংকর - প্রকৃত ঘটনা কি একটু খুলে বলুন তো?

ডমরুধর - প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে-মশার দৌরাত্ম্যে রাত্রে আমার ঘুম হত না। অনেক কষ্টে পাঁচসিকে দিয়ে একটা মশারি কিনেছিলাম।সেই মশারি খাটাবার জন্য দেয়ালে একদিন পেরেক পুতছিলাম। পেরেক মারতেই হঠাৎ দেয়ালের খানিকটা বালি খসে গেল। আর সেখানে হয়ে গেল একটা ফুটো। তার ভিতর দিয়ে হাত গলাতেই হাতে যেন কি একটা ঠেকল। সেটি বের করে এনে পরখ করে দেখি....

লম্বোদর – কি দেখলেন?

ডমরুধর - দেখি মোহরভরা এক থলি। সংগে সংগে আমি আমার দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপুর আবার সেই ছিদ্রে হাত গলাতেই দেখলাম তার অপর পাশে কাঠ। তখন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি। পরে বুঝছিলাম যে আমার আর গোলকবাবুর ঘরের দেয়াল একই, আর আমার হাত তার দেয়াল আলমারীর কপাটে ঠেকেছিল।

পবন - কি সাংঘাতিক্........

ডমরুধর - বলাই বাহুল্য, যে মোহরগুলি পেয়ে আমার যেন স্বর্গলাভ হল। আমি চুপি সেই মোহর গুনে দেখি ঠিক একশ মোহর আছে। পরদিন একটু বালি আর চুন এনে দেয়ালের ছিদ্রটি বুজালাম। তারপর বাজারে গিয়ে মোহরগুলি বেচলাম। পনেরশ টাকা হয়েছিল। তারপর সে টাকা কোথায় রাখলেম তা তো আগেই বলেছি।

শংকর - অতগুলো টাকা আপনি স্রেফ হজম করে দিলেন। ধরমে বাধল না।

ডমরুধর - দেখ বাছা, তোমার বুদ্ধিমত চললে আজ আমাকে ভিক্ষা করে খেতে হত। আর আমার বিয়েটাও হত না। তাছাড়া মা ভবানী কৃপা করে যে ধন আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তা না নিলে পাপ হত না?

পবন - ঠিক, ঠিক, আর বিয়েটা একটা বড় ব্যাপার। আমার বাবা তো আমার বিয়ের কথাটা মোটেও...

লম্বোদর - থাক, থাক তোমার ও সাতকাহন শুনে আর কাজ নেই। তা শেষমেষ কি হল ? পুলিশ এল নাকি?

ডমরুধর - আসলে এই ব্যাপারে আর একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। বড়বাজারে আমার কাপড়ের দোকানের পাশে এক পোদ্দারের স্যাঁকড়ার দোকান ছিল। আমি সেই দোকানে মোহরগুলি বেচেছিলাম। একটু দূরে গিয়ে যদি একাজ করতাম, তাহলে আর বিশেষ গন্ডগোল হত না।

পবন - তাতে আবার কি গোলমাল হয়েছিল?

ডমরুধর - আরে সেই পোদ্দার গল্পে গল্পে একদিন আমার মনিবকে কথাটা বললেন। ব্যাস তিনি অমনি কথাটা প্রকাশবাবুর কানে তুলে দিলেন।

লম্বোদর – সব্বনাশ.... তখন কি হল?

ডমরুধর - তখন সকলে জোট বেঁধে আমাকে টাকাগুলি গোলকবাবুকে ফিরিয়ে দিতে বললেন।

শংকর – তা দিলেন?

ডমরুধর – ক্ষেপেছো....আমি বললাম-‘সে মোহর তো আমার মায়ের ছিল। মা মরবার সময় আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর বিয়েতে এবং অন্য কাজে সে মোহর আমি খরচ

করে ফেলেছি। আর সে টাকা আমি এখন পাবই বা কোথায়, আর থাকলেও বা, আমি তা দেবই বা কেন?

লম্বোদর - সত্যি, আপনার বুদ্ধির জবাব নেই। তারপর তারা কি করলেন?

ডমরুধর - তারা অবশ্য আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। তখন তারা আমাকে পুলিশে দেবেন স্থির করলেন।

পবন - সে কথা শুনে আপনার বুক কাঁপল না ?

ডমরুধর - আরে দূর! আমি তখন মনে মনে ভাবলাম-পুলিশে দেয় দিক। বড়জোর এক-দু বছর জেল হবে। তারপর মেয়াদ ফুরোলে ওই টাকা নিয়ে ব্যবসা করব।

শংকর - এতকিছুর পরেও আপনি টাকাটা দিলেন না ?

ডমরুধর - আরে বাবা, তখন টাকাটা দিয়ে দিলে আমার কি দশা হত ভেবে দেখেছ? আর ভগবান আমাকে টাকাটা পাইয়ে দিয়েছেন, তা ফিরিয়ে দিলে মহাপাতক হয়ে যেতাম না?

শংকর - বলিহারি আপনার ধর্মজ্ঞান ।

পবন - তা কদিন জেল খাটতে হল ?

ডমরুধর - না রে ভাই, শেষমেষ আমায় তারা আর পুলিশে দেয় নি। কারণ আমার শ্বাশুড়ি কেঁদে-কেটে কুরুক্ষেত্র বাধালেন। শেষে সকলে মিলে আমার কাছ থেকে গোলকবাবুর পুত্রের নামে এক হাজার টাকার হ্যান্ডনোট লিখে নিলেন। ওনারা খোঁজ নিয়ে জেনে ফেলেছিলেন যে বিয়ের সময় আমি আমার জমি-জিরেতের যে গল্প শুনিয়ে ছিলাম তা সকলই মিথ্যে। অগত্যা আমি মালতীকে যে গয়নাগুলি দিয়েছিলাম, প্রকাশবাবু সেগুলিও গোলকবাবুকে দিয়ে দিলেন।

শংকর - তার মানে শেষে আপনি বেশ প্যাঁচে পড়েছিলেন।

ডমরুধর – তা পড়েছিলাম, তবে মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিলাম যে, যত পারুক হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিক। উপুড় হস্ত আমি কখনও করব না। নালিশ করবে? ডিক্রী করবে? করুক না, তাহলে ওই ডিক্রী ধুয়ে খেতে হবে। টাকাটা বার করবে কোথা থেকে শুনি?

পবন - কি সাহস আপনার। আমারও যদি এমন সাহস থাকতো, তাহলে আমার বিয়েটাও এতদিনে...

শংকর - থাম তো! তখন থেকে শুধু বিয়ে বিয়ে করে পাগল... তাহলে একটি পয়সাও আপনি বার করেন নি?

ডমরুধর – না করলাম আর ক'ই। কারন এর কিছুদিন পরেই গোলকবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে কাশী চলে গেলেন। সেখানেই তার ও তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। টাকা সম্বন্ধে তার পুত্র আমাকে অনেকবার পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু বলাই বাহুল্য, আমি সে চিঠির উত্তর দিই নি। অবশ্য টাকা যে আমাকে একেবারে দিতে হয় নি তা নয়। যাক সেসব কথা পরে বলব এখন।

শংকর - তা হলে তো আপনার তখন পোয়াবারো। তা করলেন কি তারপর?

ডমরুধর - আমি আর কি করব। যা করার তা করলেন হর ঘোষ। তিনি আমায় দোকানের কাজ থেকে ছাটাই করলেন।

লম্বোদর - সেকি ? তাহলে আপনার সর্বনাশ তো হয়েছিল দেখছি।

ডমরুধর - আরে না না। ওর জন্য আমি মোটেও দুঃখিত ছিলাম না। কারণ আমি মনে মনে জানি আমার কাছে তখন তেরশ টাকা আছে। আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, ওই টাকা দিয়ে হয় জমিদারী কিনব, না হয় ব্যবসা করব। কিন্তু ওই হ্যান্ডনোট ভয় যতদিন থাকবে ততদিন একটু চেপেচুপে থাকব।

পবন - তা চাকরি তো গেল। আর বৌদির কি হল?

ডমরুধর - আর কি... শ্বশুরমশায় আমায় ডেকে বললেন যে-'তোমাকে আর আমার বাড়ী আসতে দেব না। আজ থেকে আমি ভাবব আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে। আর জন্মে আমি অনেক পাপ করেছি, সেজন্য তোমার মত ইতরের হাতে আমার মেয়ে দিয়েছিলাম। তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়। তোমার ঘরে আমি আর মেয়ে পাঠাব না।'

পবন - ইস বৌদির কি দোষ? তা আপনার শ্বশুর তো আচ্ছা লোক।

ডমরুধর - ওনার রাগার অবশ্য অন্য কারণও ছিল। কারণ খোঁজ নিয়ে উনিও ততক্ষনে জেনে ফেলেছিলেন যে আমার দেওয়া সব গয়না গিল্টির ছিল। কাজেই ও গয়না থেকেও গোলকবাবুর কোনো লাভ হয় নি!

লম্বোদর - তা এসব শোনার পর আপনি কি ভেঙে পড়লেন?

ডমরুধর – ক্ষেপেছ! আমার তখন পুঁজির জোর হয়ে গ্যাছে। আর পয়সা দিয়ে পয়সা কি করে করতে হয় তা আমি হর ঘোষের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলাম। তখন একটাই লক্ষ্য- যেমন করেই পারি আমাকে আরো বড়লোক হতে হবে। কারণ টাকা থাকলে কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে না অমুক লোক কি করে অতো বড়লোক হল? জাল করে হোক, চুরি করে হোক যেমন করেই বড়লোক হও না কেন বাবা, তোমার টাকা আছে এ কথা শুনলেই লোকে তোমার পা চাটবে, তেল মালিশ করবে। এসব কথা অবশ্যি আমি মনেই রেখেছিলাম। এই তোমরা বলেই বলছি.... কথাটা পাঁচ কান কোরো না..... পরে অবশ্য আমার সে মনস্কামনা পুরণ হয়েছিল।

শংকর - তা কি করে হল? আবার নতুন কোন চাল চাললেন বুঝি?

ডমরুধর - তুমি কি একটু সোজা করে ভাবতে শেখনি হে, হ্যাঁ?

লম্বোদর - ওর কথা অত ধরেন কেন? ওসব বাদ দিয়ে কি করে বড়লোক হলেন তা বলুন না!

ডমরুধর - সে আর এক কাহিনী। শুনবে?

পবন – হ্যা হ্যা বলুন না।

ডমরুধর - হর ঘোষের দোকান থেকে কাজ যাবার পর আমি সুন্দরবনের এক আবাদে কিছুদিন চাকরি করি। সেই সময় আবাদ সম্বন্ধে আমার ধারনা জন্মায়।কিছুদিন পর ওই হ্যান্ডনোটের ভয় যখন গেল, তখন আমি নিজের জন্য একটি আবাদ খুজতে লাগলাম। খুজতে খুজতে শুনলাম, দূরে সুন্দরবনের কাছে এক আবাদ সুলভমুল্যে বিক্রি হবে।

লম্বোদর - আপনার এখনকার এই আবাদটির কথাই বলছেন বুঝি?

ডমরুধর - আরে বাবা শোনই না। যার আবাদ, তিনি বললেন যে এই আবাদে নোনাজল যাতে না ঢোকে সে জন্য বাঁধ দিয়েছিলেন, পানীয় জলের জন্য পুকুর কেটেছিলেন, বন পরিস্কার করে দু-চার ঘর প্রজাও বসিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে আবাদে নোনাজল ঢোকে। প্রজারা সব পালিয়ে যায়। আবাদ আবার বন-জংগলে ঢেকে যায়। পুনরায় এসব ঠিক করার মত আর পয়সা তার নেই। তাই তিনি ওই আবাদ বিক্রি করতে চান।উনি পাচ হাজার টাকায় কিনেছিলেন বটে কিন্তু এখন হাজার টাকা পেলেই বিক্রি করে দেবেন।

শংকর - তা আপনার সেই হাতানো টাকাগুলি দিয়ে ওই আবাদ কিনলেন নাকি?

ডমরুধর - আরে বিক্রি হবে বললেই ঝট করে কিনতে হবে নাকি? আগে জায়গাটা দেখতে হবে না।

পবন – তা দেখলেন জায়গাটা?

ডমরুধর – হ্যা, তা আমি নৌকা ভাড়া করে সেই স্থান দেখতে গেলাম। এসব অঞ্চলে তখন বন-জংগল ছিল, ডাঙায় ছিল বাঘের ভয়, আর জলে ছিল কুমীর।সেজন্য নৌকা থেকে নিচে নামি নি। তা, নৌকার উপর থেকেই জায়গাটি দেখে আমার বেশ পছন্দ হল।মনে মনে ভাবলাম একটু ঝুঁকি না নিলে এমন জায়গা হাজার টাকায় পাওয়া যায় না।ভগবান মোহর দিয়ে আমার প্রতি কৃপা করেছেন। কাজেই একটু যত্ন করে খাটলেই এই আবাদেও আমি আবার সোনা ফলাতে পারব।

লম্বোদর – তবু হাজার টাকা বলে কথা!

ডমরুধর – আরে আমার কাছে তখনও ছিল তেরশ টাকা। আর তাছাড়া আবাদে চাকরি করে আমি আরো পাঁচশ টাকা সঞ্চয় করেছিলেম। কাজেই হাজার টাকা দিয়ে ওই সম্পত্তি কিনলেও আমার হাতে পড়ে থাকবে আরো আটশ টাকা। ভেড়ি বাঁধতে, বন কাটতে, প্রজা বসাতে আমার শ আটের বেশী খরচ হবে না। তারপর তো শুধু মাছের তেলে মাছ ভাজা, মানে আবাদের আয় থেকেই বাকি পতিত জমি আবাদী করে নেব। এইসব ভেবেচিন্তে আমি সেই আবাদ কিনেই নিলাম। কিন্তু, তারপরই শুরু হলো আসল বিপত্তি।

লম্বোদর - আবার কি হল?

শংকর - টাকা সব জলে গেল বুঝি?

ডমরুধর - অনেকটা সেরকমই বলতে পার। আবাদ কেনার পর ভাল করে আবাদটি দেখতে গেলাম।

শংকর – একবার তো দেখলেন!

ডমরুধর – সে তো কেনার আগে। কেনার পরে আবার গেলাম; মানে আবাদে কোথায় কি করতে হবে তাই দেখবার জন্য আরকি। সংগে নিয়েছিলাম একজন সাই।

পবন – সাই আবার কে?

ডমরুধর – মানে ওই যারা মন্ত্রবলে বাঘ তাড়ায়। আর ভাড়া করেছিলাম বেশ বড় এক খানা নৌকা। তাতে মাঝি ছিল জনা ছয় । তা আমি, সাই আর তিনজন মাঝি লাঠিসোটা নিয়ে নৌকা থেকে নামলাম সে জায়গায়। আবাদের এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। যে যে স্থানে বাধ ভেঙ্গে গেছিল তাও দেখলাম। পুকুরটি ছিল একটু উচু জায়গায়, তবু তাতেও খানিকটা জোয়ারের নোনা জল ঢুকেছিল।প্রজাদের ঘরগুলির মধ্যে একটি বাদে বাকি সবই ছিল ভাঙ্গা। আমার আবার সেই ঘরখানির ভেতরটা দেখার ইচ্ছা হল। একটু এগোতেই দেখি একখানা বিশাল বাঘ মরে পড়ে আছে।

লম্বোদর – বলেন কি?

ডমরুধর – হ্যা.....আমাদের তো আক্কেল গুড়ুম। সাই বলল যে, হয়ত অন্য কোন সাই মন্ত্রবলে বাঘটিকে মেরেছে।কারণ বাঘের গায়ে কোন গুলি বা অস্ত্রের চিহ্ন ছিল না।

পবন - বা বা... ! সাইদের মন্ত্রের তো বেশ তেজ আছে।তারপর ?

ডমরুধর - আমরা তো গুটি গুটি পায়ে সেই ঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। ঘরের সামনে গিয়ে দেখি তার কোন আগড় বা কপাট নেই। দরজার সামনে দাঁড়াতেই কেমন একটা বন বন শব্দ কানে এলো। প্রথমে ভাবলাম মৌমাছির শব্দ বুঝি, ঘরের ভেতরে বোধহয় কোন মৌচাক আছে।কিন্তু পরক্ষণেই যা দেখলাম...ভাবতেই এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

লম্বোদর – (ভর্য়াত কন্ঠে) কি দেখলেন ?

ডমরুধর - দেখলাম কালো কালো চড়াই পাখির মত কি সব শয়ে শয়ে দেয়ালের গায়ে বসে আছে। তাদের আবার দুখানি করে ডানা। তারা উড়বার জন্য ডানা নাড়লেই অমন বন বন করে আওয়াজ হচ্ছে। তাদের সারা গায়ের রঙ কালো কিন্তু ঢাউস পেটগুলো রক্তবর্ণের।

পবন - ওরা বোধহয় রক্তবর্ণের কিছু খেয়ে থাকবে তাই পেটগুলি অমন টইটম্বুর।

লম্বোদর - এ কোন জীব?

ডমরুধর - কি জানি, আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ আমার মনে হল, হয়ত এরাই রক্তপান করে ওই বাঘটিকে মেরে থাকবে। এরই মধ্যে, আমাদের সাই এক নির্বোধের মত কাজ করে বসল।

শংকর –মন্ত্রপূতঃ বন্দুক বার করল?

ডমরুধর - না...মাটিতে তার হাতের লাঠিটি ঠুকে দুম দুম আওয়াজ করল। ব্যস আর যাবে কোথায়। গুটিদশেক আধপেটা জীব, দেয়ালের গা থেকে উড়ে সাইয়ের গায়ে এসে বসল। সাই তো লাঠি ফেলে বাবা গো মাগো বলে ছুটতে শুর করল। হাত দশেক যেতে না যেতেই সাই মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

পবন - আর আপনারা ?

ডমরুধর - আমরা সাইয়ের কাছে গিয়ে দেখি তখনও দশ-বারোটা কালো জীব তার গায়ে বসে আর সাই যন্ত্রনায় ছটফট করছে। লাঠি দিয়ে আমি তাদেরকে সাইয়ের গা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। আমার মাঠির আঘাতে পাচটি কালো জীব সাইয়ের গা থেকে উড়ে গেল। তাদের একটি আবার আমার গায়ে এসে বসতেই দিলাম লাঠির এক মোক্ষম ঘা। জীবটি মরে মাটিতে পড়ল। আমি তাকে হাতে তুলে নিলাম। বাকিগুলো উড়তে উড়তে গিয়ে বসল আর এক মাঝির গায়। সেও যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে দৌড় দিল। কিন্তূ কয়েক হাত গিয়েই মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। সাইয়ের দিকে চেয়ে বুঝলাম সে আর বেঁচে নেই। আমি বুঝলাম এ জীব শুধু রক্তপানই করে না, এর ভয়ানক বিষও আছে। তখন অবশিষ্ট দুই মাঝিকে নিয়ে দৌড়ে নৌকায় গেলাম, আর তক্ষুনি নৌকা ছেড়ে দিয়ে সেই স্থান থেকে পালালাম। নৌকায় বসে ভাবতে লাগলাম। মনে হল আমার টাকাগুলি বোধহয় জলেই গেল। পাপের ধন বুঝি প্রায়শ্চিত্তে গেল।

শংকর - আমি তখনই জানতাম পরের টাকা এভাবে অন্যায়ভাবে নিয়ে ভাল কিছু করা যায় না। আপনার তখনি বোঝা উচিত ছিল যে কেন পাচহাজার টাকার সম্পত্তি সে লোক এক হাজার টাকায় দেবে?

লম্বোদর - আর ওই কালো চড়াইয়ের মত জীবটাই বা কি?

ডমরুধর - ও হ্যা...(দীর্ঘশ্বাস) যে জীবটি আমি মেরেছিলাম তা তো আমি সঙ্গে নিয়েই নৌকায় উঠেছিলাম। নৌকার পাটাতনে রেখে ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করলাম। কিছুক্ষণ উল্টে পালটে দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। দেখলাম যে সে আর কিছু নয়...বড় আকারের মশা, মানে চড়াই পাখির মত বড় মশা।

শংকর – ফাজলামি মারছেন?........মশা এত বড় হয় তা তো কখনো শুনি নি। আবার একটা গল্প দিচ্ছেন মনে হচ্ছে?

ডমরুধর - কতকিছুই তো জীবনে অজানা থাকে। তার কতটাই বা আমরা জানি।তবে সে জিনিস যে মশা ছিল তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।তার শরীরটি ছিল চড়াই পাখির মত। আর শুড় ছিল বড় জোকের মত।সেই শুড়ে ছিল ভয়ানক বিষ। ডাক্তারেরা যেরকম ছুরি দিয়ে ফোড়া কাটে, তার শুড়ের আগায় আবার তেমন একখানি ছুরির মত ছিল।জীবজন্তুর গায়ে বসে সে আগে সেই ছুরি দিয়ে খানিকটা চামড়া ও মাংস কেটে নিত তারপর রক্তপান করে ছিবড়ে বানিয়ে ছাড়ত। । আর শুড়ের বিষে সব প্রাণী ধড়ফড় করে মারা যেত।

লম্বোদর - কি করে জানলেন যে, সে জীব অন্য কোন নতুন ধরনের পাখি নয়?

ডমরুধর - এ আর কঠিন কি? পাখিদের দুটো পা থাকে, আর এর ছিল ছটি পা; এর ডানায় পাখিদের মত পালক ছিল না; আর পাখিদের থাকে ঠোট, এর ছিল শুড়। এছাড়া পাখিদের শরীরে হাড় থাকে, কিন্তু এর শরীর ছিল কাদার মত নরম।

শংকর - তবু এত বড় যে মশা হয়, তা আমার বিশ্বাস হয় না। কচ্ছপ মার্কা ধূপ জালিয়ে দেখেছিলেন, মরে কি না....

পবন - কেন বিশ্বাস হয় না শুনি? এই যে হাতি, সেও তো বড় মশা ছাড়া কিছু নয়।

লম্বোদর – হাতি ...মশা... কি বলছ?

পবন – হ্যা। মশার শুড় আছে, হাতিরও শুড় আছে। তবে হাতি যদি রক্ত খেত তা হলে পথিবীতে আর কোন জীব জী্বিত থাকতো না। সেই জন্য তো হাতি গাছপালা খেয়ে প্রাণধারণ করে।

শংকর - তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। মশা এত বড়......

ডমরুধর - আরে শোন শোন, আমার কাছে এর প্রমান আছে। প্রমান ছাড়া আমি কিছু বলি না।

শংকর - কি প্রমান?

ডমরুধর - ওই মশার প্রমান স্বরূপ আমি জোঁক রেখেছি। আমাদের গ্রামের কাছে যে বিল আছে, মশার শুড়টি কেটে আমি সেই বিলে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই শুড় থেকে এখন অনেক বড় বড় জোঁক হয়েছে। আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তা হলে না হয় জলায় একবার নেমে দেখ। প্রমান ছাড়া আমি কথা বলি না ...হে হে...।

শংকর - মশার শুড় থেকে তো জোঁক হতে পারে না? জোঁক, জোঁক থেকেই হয়।

লম্বোদর- কেন হবে না? স্বে থেকে স্বেদজ জীব হয়। বাদা বনের পাতা পচে চিংড়ি মাছ হয়। কোন দিগ্বজ লোক কৃষিকাজ সম্বন্ধে একখানা বাংলা স্কুলপাঠ্য বই লিখেছিলেন। তাতে পুদিনা গাছ সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন- ‘একখানি দড়িতে গুড় মাখিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। তারপর মাছির মলমুত্রে দড়িটি যখন ভরে যাবে, তখন সেই দড়ি রোপণ করতে হবে। তা থেকে পুদিনা গাছ উৎপন্ন হবে।- মাছির ইয়ে থেকে যদি পুদিনা গাছ হতে পারে, তবে মশার শুড় থেকে জোঁক হবে না কেন?

ডমরুধর - যাক অহেতুক তোমরা এ নিয়ে আর গোল করো না। প্রমান যখন সকলে পেয়েই গেছে তখন আর...... ও হ্যাঁ যা বলছিলাম। তখন তো আমার চিন্তায় মাথার চুল ছেড়ার জোগাড়। আমার অতো কষ্টের টাকা সব বিফলে যাবে। কিন্তু তোমরা তো জান, সহজে আমি কোন কাজে হাল ছাড়ি না।

পবন - আবার নতুন কোন বুদ্ধি বার করলেন বুঝি?

ডমরুধর - তা তো বটেই। গ্রামে ফিরে এসে অনেক ভেবে চিন্তে মশা ধরার জন্যে বিরাট এক মশারি তইয়ারি করালাম।

শংকর – মশারি নয় বলুন, চড়ুরি...

পবন – মানে?

শংকর – চড়াই পাখির মত যদি মশা হয় তবে সে মশার জন্যে যে মশারি তার নাম চড়ুরি হওয়াই স্বাভাবিক।

লম্বোদর- থাম তো... যতসব... ডমড়ুবাবু.. আপনি বলুন তো, কি করলেন মশারি দিয়ে?

ডমরুধর – তা শংকর কথাটা খারাপ বলে নি, কারন সে মশারি সাধারন নয়... কাপড়ের বা নেটের মশারি তো নয়ই। একেবারে জেলেরা যে জাল দিয়ে মাছ ধরে সেই জাল দিয়ে তৈরি হল সেই জাদরেল জিনিষ। পাঁচজন সাওতাল কাজের লোকও জোগাড় করলাম।

পবন – সাওতাল কেন?

ডমরুধর – আরে শোনই না....তারপর বড় একখানা নৌকা ভাড়া করে সেই পাচজন সাওতালকে সঙ্গে নিয়ে আবার সেই আবাদে গেলাম। নৌকা ডাঙ্গায় ভিড়িয়ে আমরা ধীরে ধীরে নৌকা থেকে নামলাম।চার কোনে চারটি বাঁশ দিয়ে চারজন মাঝি ভিতর থেকে মশারি উচু করে ধরল। আর মশারির ভিতর পাঁচজন সাওতাল তীর ধনুক নিয়ে তৈয়ারি থাকল।

শংকর – তীর ধনুক কেন?

ডমরুধর –মশা মারবে বলে...

শংকর – সাহিত্যকের মজা করে কামান দেগে মশা মারার কথা বলে শুনেছি... তীর ধনুক দিয়ে মশা মারার কথা এই প্রথম শুনলাম।

ডমরুধর – কামানও দাগা যেত, তবে তাতে খরচা হত অনেক বেশি..

শংকর –তাতো বটেই।

লম্বোদর- তুমি থামো তো হে... তখন থেকে হাবিজাবি প্রশ্ন করে গল্পের মেজাজটাই নষ্ট করে দিচ্ছ... ডমড়ুবাবু.. আপনি বলুন তো।

ডমরুধর – মশারির ভিতরে থেকে আমরা দশজন আস্তে আস্তে আবাদের অভ্যন্তরে এগোতে লাগলাম। বেশী দূর আর যেতে হয় নি। মশারা বোধহয় অনেকদিন উপোসী ছিল। মানুষের গন্ধ পেয়েই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে মশারির গায়ে এসে বসল, কিন্তু মশারির ভেতরে ঢুকতে পারল না। এদিকে সাওতাল পাঁচজন ক্রমাগত তীর ছুড়ে তাদের মারতে লাগল।

লম্বোদর - তা সেদিনই সব মশা মারা গেল নাকি?

ডমরুধর - আরে না না। অত মশা একদিনে মারা যায় নাকি? সেদিন আমরা আড়াই হাজার মশা মেরেছিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ বন্ধ করে আবার নৌকায় ফিরে আসলাম।সাওতালরা অবশ্য এক ঝুড়ি মরা মশা সংগে এনেছিল। শুড়, পা আর ডানা বাদ দিয়ে রাত্রে তা পুড়িয়ে খেয়েওছিল। জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল সে মাংস নাকি অতি সুস্বাদু, ঠিক বাদুড়ের মাংসের মত। আমাকেও চেখে দেখতে বলেছিল কিন্তু আমার রুচি হয় নি।

পবন - তা সব মশা মারতে কতদিন লাগল?

ডমরুধর - দ্বিতীয় দিন আমার হাজার দুয়েক মশা মেরেছিলাম। তারপর দিন ষোলশ, তারপর বারশ ... তারপরের দিন...

পবন- আটশ মশা মারলেন... তার পরের দিন চারশ...

ডমরুধর – তুমি জানলে কি করে?

শংকর – দিন প্রতি চারশ করে কমছে... সেই হিসাবে..

ডমরুধর – বাঃ! ছেলের মাথাতো বেশ পরিষ্কার।

পবন- আজ্ঞে হ্যা। ঐ হিসাবে দুদিন পরে অবশ্য আর কোন মশাই মারার কথা নয়..

ডমরুধর – ঐ খানে'ই ভুল হয়ে গ্যালো তো। চারশর পর মশা মারার হার দিন প্রতি বেড়েছিল ব'ই কমে নি.... তা যাক গে...এমনি করে প্রতিদিন আমরা মশার সংখ্যা কমাতে লাগলাম। মোট পঁয়ত্রিশ দিনে মশার বংশ একেবারে নিঃশেষ হল।

লম্বোদর – একেবারে নিঃশেষ?

ডমরুধর – হ্যা....হয় আমরা সকল মশা মেরে ফেলেছিলাম কিংবা অবশিষ্ট মশারা অন্যত্র পালিয়েছিল। যাই হোক তারপর থেকে আমার আবাদে আর বড় মশার উৎপাত হয় নি। মশার হাত থেকে পরিত্রান পাবার পর আমি আবার আবাদের চারিদিকে ভেড়ি বাধালাম। বন-জংগল কেটে, পুকুর সংস্কার করে কয়েক ঘর প্রজাও বসালাম। এ সব কাজ করতে আমার সঞ্চিত আটশ টাকাও খরচ হয়ে গেল। কিন্তু তখনও দেখলাম যে আরও হাজার টাকা খরচ না করলে কিছুই হবে না। কিন্তু সমস্যা হল তখন আমি আরও হাজার টাকা পাবো কোথায়।

শংকর - তা কি করলেন? আবাদ বেচা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না নিশ্চয়?

ডমরুধর - আরে বাবা আমি তো আগেই বলেছি যে আমি অতো সহজে হারার লোক না।

লম্বোদর - তা হাজার টাকা জোগাড় করলেন কোথা থেকে?

ডমরুধর - সে আর এক কাহিনী। তা তোমাদের যদি আপত্তি থাকে...।

পবন - কি যে বলেন আপনি? আপনার কথা আমাদের কাছে অমৃত সমান।

লম্বোদর - হ্যা হ্যা, বলুন আপনি।

ডমরুধর - বেশ শুনতেই যখন চাও, তখন শোন। আমাদের গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ দূরে কাঁচপুরের স্বরূপ সরকেলের সংগে আমার আলাপ পরিচয় ছিল।

পবন – কি করে আলাপ হল?

ডমরুধর - সেই হর ঘোষের কাপড়ের দোকানে যখন কাজ করতাম তখন তিনি আমাদের খরিদ্দার ছিলেন। কাপড়ের দাম নিয়ে তিনি অন্য খরিদ্দারের মত হেচড়া-হেচড়ি, কচলা-কচলি করতেন না। তিনি দোকানে আসলেই তিন সত্যি করে ধরমের দোহাই দিয়ে তাকে বলতাম যে তার কাছ থেকে এক আনার বেশী লাভ করব না। কিন্তু ফলে তাকে বিলক্ষণ ঠকাতাম।

শংকর – উনি আপনাকে বিশ্বাস করতেন আর আপনি তাকে ঠকাতেন!!

ডমরুধর -আমি ব্যবসাদারের চাকর ছিলাম। দোকানদারদের রীতিই এই। আলাপী লোকেরা দোকানদারকে বিশ্বাস করে, আর সেই সুযোগ নিয়ে দোকানদার তাদের ঠকায়। বড়বাজারে যখন বসতাম তখন আমিও প্রতিদিন হাজার হাজার মিথ্যা কথা বলতাম আর শত শত লোক ঠকাতাম। না ঠকালে কাজই চলত না যে। যাই হোক, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে সরকেল মশায়ের পরিচয় হয়েছিল।

শঙ্কর - বাবা, এতো জীবনে প্রথম শুনলাম যে ঠকানোর ফলে লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়।

ডমরুধর - আরে আমি কি তাই বললাম। আমি বললাম দোকানে যাতায়াতের কারনে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। যাগগে যা বলছিলাম...আমি জানতাম যে সরকেল মশায়ের একটা ছোটখাট জমিদারী ছিল আর তার সঙ্গে তিনি তেজারতি কারবারও করতেন। আমি ভাবলাম যে তার কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা ধার করে আমার আবাদের পতিত জমি উঠিত করাব।

লম্বোদর - তা উনি টাকা ধার দিলেন?

ডমরুধর – এমনিতে দিতে চাইলেন না । তখন তার কাছে আবাদ বাঁধা রেখে হাজার টাকা ঋন চাইলাম। তিনি বললেন যে আবাদ না দেখে তিনি তো আর টাকা দিতে পারেন না। তিনি তার গোমস্তাকে আমার আবাদ দেখতে পাঠালেন আর আমাকে আবার সাতদিন পরে দেখা করতে বললেন। যাই হোক, ফেরবার সময় তার ওখানে একটা ব্যাপার দেখে বেশ মজা পেলাম।

পবন - কি ব্যাপার?

ডমরুধর – তেমন কিছু না। দেখলাম যে দুজন সন্ন্যাসী এসে সরকেল মশায়ের বাড়ির বাইরে আড্ডা বসিয়েছেন। তাদের সঙ্গে ছিল তিনটি ঘোড়া আর বড় কালো পাথরের তৈরি এক কালীর প্রতিমা। প্রতিমাটি রাখা ছিল এক চারিপাশ ঢাকা জমকাল সিংহাসনে।দুই সন্ন্যাসী দিনে তিনবার দেবীর পূজা করে। আর সারা দিন ধরে বাড়ির বাইরে হাজার দর্শনার্থীর ভিড়। সে খুব ধুম-ধাম ব্যাপার। আরও জানলাম যে সন্ন্যাসীরা এই গ্রামে আসার পর থেকে সরকেল মশায়ই তাদের সমস্ত ব্যয় বহন করছেন।

শঙ্কর - এ আর নতুন কি? সাধু হোক আর সন্ন্যাসী হোক, তারা সবসময়ই বড়লোকের বাড়িতেই ওঠে। তা আপনার টাকা ধারের কাহিনীর মধ্যে আবার সন্ন্যাসী এল কোথা থেকে?

ডমরুধর - আরে বাবা বলছি বলছি। তা সরকেল মশায়ের কথা মত আমি সাতদিন বাদে আবার ওনার বাড়ি গেলাম। ওনার দোতলা পাকা বাড়ি। পশ্চিমে অন্তঃপুর আর পুবে সদরবাটি। সেদিন যেতে যেতে আমার রাত হয়ে গেছিল। সেজন্য সেরাতে টাকা-কড়ি সম্বন্ধে আর কোন কথা হল না। তাই আহারাদি সেরে আমি পূজোর দালানে শুয়ে পড়লাম। সারাদিন পথশ্রমে এমনিতেই ক্লান্ত ছিলাম, তার উপর রাতের খাওয়াটা ভাল হওয়াতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ মাঝরাতে দুম দুম কি একটা আওয়াজে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। রাত বোধহয় তখন একটা-দুটো হবে। ভাল করে খেয়াল করে দেখি আওয়াজ আসছে বাড়ির ভিতর থেকে।প্রথমে ভাবলাম ডাকাত পড়েছে বুঝি। পরে খেয়াল করে দেখি, না, তা নয়।

লম্বোদর – কি তাহলে?

ডমরুধর -মনে হল একটা ভারী জিনিস এক সিঁড়ি থেকে আর এক সিঁড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে উপর থেকে নীচে নেমে আসছে।

শঙ্কর - আবার একটা অন্য কোন জন্তুর গল্প ফাঁদছেন মনে হচ্ছে?

লম্বোদর - তুমি থাম তো শঙ্কর। আপনি বলুন।

ডমরুধর - সেই রথের সময় পুরুষত্তমে জগন্নাথের কোমরে দড়ি বেধে উড়ে পান্ডারা যেমন মন্দিরের সিঁড়ির এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে নামায় দেখেছ তো, তা আমি ভাবলাম সরকেল মশায় বুঝি সেরকম ভাবে কোন ভারী বস্তু উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামাচ্ছেন।

পবন - আর কোন লোকজন দেখতে পেলেন না?

ডমরুধর – রাতের অন্ধকারে কিছু ঠাহর হয় না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির ভিতর একটা হইচই পড়ে গেল। আমি পষ্ট শুনলাম সরকেল মশাই চিৎকার করছেন আর বলছেন কে যেন তার লোহার সিন্দুক নিয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীলোকেরাও চিৎকার করে বলতে লাগল যে ভূতে নাকি তাদের লোহার সিন্দুক নিয়ে যাচ্ছে।

লম্বোদর – ভুতে?

ডমরুধর – আমি তো আর নিজের চোখে দেখি নি। পরে শুনেছিলাম যে সিন্দূক নাকি আপনি আপনিই ঘর থেকে বার হয়েছিল। আপনি আপনিই সিঁড়ির এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল।

পবন – আর সরকেল মশায় কিছু বাধা দেন নি...

ডমরুধর –সরকেল মশায় নাকি সিন্দুকের একটা আংটা ধরে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরমুহুর্তেই সিন্দুক তার পায়ের উপর পড়ে তার পা ছেঁচে দিয়ে নিচে নেমে এসেছিল। আর তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে ধরাশায়ী হয়ে গেছিলেন।

শঙ্কর - এর মধ্যে আবার আপনার কোন হাত.ছিল নাকি..

ডমরুধর - আমি কি ডাকাত নাকি? নাকি জাদুকর ? তোমার জ্বালায় দেখছি কোন কথাই বলা যাবে না। বলছি সিন্দুক নিজে নিজেই নিচে নেমেছিল।তারপরেও এসব কথা ...

লম্বোদর - না না আপনি চটবেন না।ও তো অমন করে তা তো আপনি জানেন। আপনি আপনার মত বলে যান তো...

ডমরুধর - হ্যা তা যা বলছিলাম। সিন্দুক তো নিচে নেমে অন্দরবাড়ির দরজা ভিতর থেকে দুম দুম করে ধাক্কাতে লাগল।তারপর দরজা ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। আমি নিজের চোখে দেখলাম যে সিন্দুক মাটি থেকে হাত খানেক উপর দিয়ে শুন্যপথে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পবন – আপনি তখন কি করলেন?

ডমরুধর –আমি তাই দেখে তাড়াতাড়ি দালান থেকে নেমে সিন্দুকের একটা আংটা ধরে টানতে লাগলাম।সেই সময় সরকেল মশায়ের দারোয়ান রাম সিংও দৌড়ে এসে অন্য দিকের আংটা ধরে ফেলল। সিন্দুকও অমনি মাটিতে নেমে এসে দারোয়ানের পা ছেঁচে দিল। সে তো মাটিতে পড়ে ‘জান গিয়া জান গিয়া’ বলে চেঁচাতে লাগিল।ভাগ্যিস আমার পায়ে পড়ে নি। তাহলে আর এ কাহিনী শোনাতে হত না। আমি ভাবলাম এ নিশ্চয় কোন ভৌতিক ব্যপার। কাজেই সিন্দুক ধরে রাখার আর কোন চেষ্টা করলাম না।

পবন - তা সিন্দুক গেল কোথায়?

ডমরুধর - সিন্দুক তো তারপর সদর দরজায় গিয়ে তাতে জোরসে বাড়ি মারতে লাগল। তিন ধাক্কায় সদর দরজাও ভেঙ্গে গেল। দরজা ভেঙ্গে সিন্দুক শুন্যপথে মাঠের দিকে যেতে লাগল। মাঝরাতে অমন শব্দ শুনে গ্রামের লোক ভেবেছিল বুঝি সরকেল মশায়ের বাড়ি ডাকাত পড়েছে। লাঠি সোটা নিয়ে তারাও দৌড়ে এল। কিন্তু সিন্দুক তখন মাঠের উপর দিয়ে গ্রামের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই সময় আরো একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটল। সরকেল মশায়ের বাড়ি এবং নিকটস্থ প্রতিবেশীদের বাড়িতে যত হাতা, বেড়ি, কড়া, দা, কুড়ুল, ছুরি, কাচি যা কিছু লোহার জিনিস ছিল সবই বাইরে বার হয়ে সন সন শব্দে শুন্যপথে সিন্দুকের পিছু পিছু চলল। এরপর যা হল তা বললে তোমরা আর বিশ্বাস করবে না, সুতরাং চুপ করে থাকাই ভাল।

শঙ্কর – (উত্তেজিত কন্ঠে) বিশ্বাস করি আর না করি বলুন না ছাই।

লম্বোদর ও পবন - না না। বিশ্বাস করব না কেন? তারপর কি হল বলু...উ...ন না।

ডমরুধর - তা এত করে বলছ যখন তখন বলি। আমার কোমরে তখন একগোছা চাবি থাকত। কিন্তু তখন আমার বাক্স ছিল মাত্র দুটো।

পবন – তা এত চাবি রাখার কারন?

ডমরুধর - লোকে মনে করবে আমার অনেক টাকা আছে, টাকা রাখতে জায়গা পায় না, তাই অনেক বাক্স হয়েছে আর চাবিগুলো সেই বাক্সের।

লম্বোদর - তাহলেও... লোককে বুঝিয়ে লাভ কি?

ডমরুধর - দেখ লম্বোদর, মুখবন্ধ গুড়ের ভাড়ের কাছে কত মাছি থাকে দেখেছে? একফোঁটা গুড়ও তারা খেতে পায় না। কিন্তু আশেপাশে কেমন ভনভন করে। তেমনি একবার যদি রটে যায় অমুকের টাকা আছে তাহলে দেশশুদ্ধু লোক তোমার কাছে ভনভন করবে, তোমায় মান্যি করবে।

শঙ্কর - তা চাবির গোছার সঙ্গে বিশ্বাস অবিশ্বাসের সম্বন্ধ কি?

ডমরুধর - আছে আছে। লোককে দেখাবার জন্য আমি একগোছা চাবি কোমরে পরতাম। চার-পাঁচটি ঘুনসি একসাথে পাকিয়ে মোটা দড়ির মত করে তাতে চাবির গোছা বেধে রাখতাম।

শঙ্কর – বেশ...

ডমরুধর - তা লোকের হাতা, বেড়ি, কড়া, দা, কুড়ুল, ছুরি, কাচি ইত্যাদি যখন সেই লোহার সিন্দুকের পিছু পিছু ছুটল, তখন আমার সেই চাবির গোছাতেও লাগলো টান। এমনি সাধারণ অবস্থায় চাবি তো ঝুলে থাকে, তখন একেবারে সোজা সটান হয়ে সিন্দুকের পিছু পিছু যাবার চেষ্টা করতে লাগল। ঘুনসির দড়ি আমার কোমরে চেপে বসে গেল আর তার চাপ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

লম্বোদর – চাবির কি চাপ!

ডমরুধর – হ্যাঁ ....শেষে মনে হল কোমর কেটে বুঝি শরীরটাই দুখানা হয়ে যাবে। চাবির সেই তীব্র টান আমাকেও মাঠের দিকে সিন্দুকের পিছু পিছু মাঠের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।আমি বাঁচাও বাঁচাও করে তারস্বরে চিৎকার করে সকলকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু সকলে ভৌতিক ব্যাপার মনে করে যে যেদিকে পারল পালাল আর অন্যরা যার যার ঘরে গিয়ে খিল দিল।

পবন - কি ভয়ানক। আমার তো ভুতের ভয়ে গায়ে কাটা দিচ্ছে গো। আর আপনার? মানে আপনি তখন কি করলেন?

ডমরুধর - আমার কি আর কিছু করার ছিল যে করব। চাবির গোছা তো আমায় মাঠ দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। জোৎস্না রাত, তাই চারিপাশে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মাঠের মাঝে সামনে দেখি অনেক আগে তিনটি ঘোড়া যাচ্ছে। দুটো ঘোড়ার উপর সেই দুই সন্ন্যাসী বসে আছে। আর তৃতীয় ঘোড়ার উপর সেই পাথরের কালী মুর্ত্তি ও পূজোর

আসবাব বোঝাই আছে। তার পিছনে প্রায় দুশো হাত দূরে সেই লোহার সিন্দুক শুন্যপথে যাচ্ছে। সিন্দুক থেকে আরো দুশো হাত দূরে চলেছে সেই সব লোহার হাতা, বেড়ি, কড়া, দা, কুড়ুল, ইত্যাদি। তারও প্রায় দুশ হাত দূরে চাবির গোছা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

লম্বোদর - এমন করে কতদুর গেলেন ?

ডমরুধর - তা ক্রোশ দুই তো হবেই। তারপর হঠাৎ দুম করে এক শব্দ; চেয়ে দেখি যে দূরে সিন্দুকটি মাটিতে পড়েছে আর ঘোড়া তিনটে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আর সন্ন্যাসী দুজন ঘোড়ার পিঠ থেকে থেকে নেমে কালীর প্রতিমাটি সেই জমকালো সিংহাসনে রেখেছে। আর সেই সিন্দুক যেই না মাটিতে পড়া, সঙ্গে সঙ্গে সেই সব হাতা, খুন্তি, বেড়ি, কড়াই, ছুরি, কাচিও মাটিতে পড়ল। আমার কোমরের চাবিও আবার আগের মত ঝুলে পড়ল। আর কোমরে ঘুনসির সেই টানও আর রইল না। তখন একটু ধীরে সুস্থে শ্বাস ফেলার অবসর পেলাম। কিন্তু আমার নড়বার ক্ষমতা প্রায় লোপ পেয়েছিল। অচৈতন্য হয়ে প্রায় ঘন্টা খানেক পড়ে থাকলাম।

পবন - ভূতের হাত থেকে বেঁচে গেছিলেন এই কপাল। তারপর ?

ডমরুধর - তারপর যখন আবার নড়াচড়া করার ক্ষমতা ফিরে পেলাম, তখন আবার চেয়ে দেখি সেই সন্ন্যাসীরাও নেই, কালী প্রতিমাও নেই আর সে ঘোড়াগুলোও নেই। শুধু সিন্দুকটা মনে হল যেন সেখানে পড়ে আছে। যাই হোক আমি অতি সাবধানে, ভয়ে ভয়ে, গুটি গুটি পায়ে সেইখানে গেলাম। দেখলাম যে সিন্দুকের ডালা খোলা। তার ভিতর টাকা-কড়ি, গয়না-গাটি যা কিছু ছিল সবই নিয়ে গেছে। চারিদিকে কাগজ-পত্র দলিল কোম্পানীর কাগজ ছড়িয়ে আছে। আমি তা ছুয়ে দেখি নি। একতাড়া কাগজ দেখি একটু দূরে পড়ে আছে। বোধহয় সিন্দুক ভাঙ্গার সময় ছিটকে গিয়ে থাকবে। সেগুলো তুলে যা দেখলাম তাতে আমার হাত-পা তুলে নাচতে ইচ্ছা করছিল।

লম্বোদর - কি দেখলেন ?

ডমরুধর - নোট, নোট, সব নোট। লম্বোদর! তোমাদের তো আমি বলেইছিলাম যে আমি ভাগ্যবান পুরুষ। আর মা ভবানী সর্বদাই আমায় কৃপা করেন। সেদিন তার প্রত্যক্ষ প্রমান পেলাম। নোট হাতে পেয়েই শুরু করলাম দৌড়। বেলা নটায় বাড়ি পৌছে তবে হাফ ছাড়লাম।

শঙ্কর - এ সব আপনার আজগুবি গল্প। এ অনেক দিনের কথা বটে, তবে তখন তো আমরা অন্য রকম শুনেছিলাম।

পবন - কি শুনেছিলেন ?

শঙ্কর - শুনেছিলাম যে সরকেল মশায়ের বাড়িতে বেশ বড় রকমের চুরি হয়েছিল। আর সেইসব চোরেরা নাকি আমাদের ডমরুবাবুর পরিচিত ছিল। আর চোরেদের নাকি উনিই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

ডমরুধর - এসব সর্ব্বৈব মিথ্যা। হিংসা, হিংসা। বোঝ না হিংসায় মানুষ কত কি বলে। মা আমার উপর কৃপা করেন বলে লোকেরা...

লম্বোদর - হ্যা, লোকেরা ওরকম নানা কথা বলে। কিন্তু তাতে কান দিলে কি চলে? যাই হোক কত টাকা পেয়েছিলেন?

ডমরুধর - বাড়ি এসে দরজা বন্ধ করে গুনে দেখি দুশটি দশ টাকার নোট, মানে মোট দুই হাজার। ব্যাস আর ঋনের কি দরকার? সরকেল মশায় কে পরে অবশ্য চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে ওনার বাড়িতে গিয়ে ভুতের হাতে প্রাণ হারাতে বসেছিলাম। তাই ওনার টাকায় আমার আর প্রয়োজন নেই।

পবন - তা সেই টাকা দিয়ে সমস্ত আবাদটি নতুন করে গড়লেন নাকি?

ডমরুধর - হ্যা! তা তো বটেই। দেখছ না এখন আবাদে কেমন সোনা ফলছে। তার লাভ থেকেই আমি ক্রমে ক্রমে আরও অনেক আবাদ কিনলাম। আমি এখন ছাই মুঠো করলেই সোনা হয়ে যায়। এই জনহীন জায়গায় এখন আরো কত আবাদ হয়েছে। বহুদুর পর্যন্ত লোকের বসবাস হয়েছে। নদীতে খেয়া বসেছে, মাঝে মাঝে হাটও বসছে তা তো জান। গরমের সময় এখন কুলপি মালাই পর্যন্ত পাওয়া যায়।

লম্বোদর - সত্যি ভগবান যাকে দেন এমন ছপ্পড় ফুঁড়েই দেন।

ডমরুধর - অমনি কি আর আমি ফি বছর মায়ের পূজো করি। এই দেখনা এখন আমার কিরকম সম্পত্তি হয়েছে; আর লোকে কিরকম আমায় মান্যি গন্যি করে তা তো তোমরা জানই।

পবন - কিন্তু আমাদের বৌদি। তাকে তো হারাতে হল!

ডমরুধর - কে বলল? ও...হো... কথায় কথায় বলিনি বুঝি; আমার ভবিষ্যত বানী ফলে গিয়েছিল। প্রকাশবাবু, মানে আমার শ্বশুরমশায়, আমার রমরমা দেখে নিজে এসে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে মালতীকে দিয়ে গেছিলেন। তারপর অবশ্য তিনি নিজে, তার ছেলেরা, তার সেই বিধবা বোন কতবার যে আমার বাড়িতে এসেছেন তার গুনতি নেই। এখন অবশ্য তাদের সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই। শুনেছি ম্যালেরিয়ার মহামারীতে তারা কেউই আর ইহলোকে নেই।

শঙ্কর - অনেক কথাই তো শুনলাম। এও শুনলাম যে চোরেদের সঙ্গে আপনার পরিচিতি নেই। আর এও না হয় বুঝলাম যে চোরেদের আপনি ভেতর থেকে দরজা খুলে দেন নি।কিন্তু লোহার সিন্দুক এবং অন্যান্য লোহা লক্কড়ে টান ধরেছিল কি ভাবে?

ডমরুধর - একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না, তবে একটা আন্দাজ আমি করেছিলাম। আমি যখন বড়বাজারে কাপড়ের দোকানে কাজ করতাম, তখন কোন কোন দিন সন্ধ্যাবেলা সেখানে বই পড়া হত। একদিন রামায়ণ মহাভারতের পর একজন আরব্য উপন্যাস পড়ছিলেন। তাতে এক রাজপুত্রের গল্প শুনেছিলাম। তাতে ছিল যে রাজপুত্র জাহাজে করে দেশ-বিদেশ দেখতে বেরিয়েছিলেন। অবশেষে ঝড়ে দিক ভুলে জাহাজ এক কালো রঙ-এর পাহাড়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। জাহাজের যত পেরেক ছিল সব খুলে সেই পাহাড়ে গিয়ে লাগল আর জাহাজ ডুবে গেল।

পবন – এ গল্পের সাথে ওই ঘটনার কি সর্ম্পক?

ডমরুধর - আমার মনে হয়, ঐ সন্ন্যাসীদের যে কালো পাথরের কালী প্রতিমা ছিল তা একটি বিরাট শক্তিশালী চুম্বক। যে সে চুম্বক নয়। চোলাই করা চুম্বক পাথরের সার। আর সিংহাসনটি এমন জিনিস দিয়ে তৈরি যে তার ভেতর দিয়ে চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি দূরে যেতে পারে না। প্রথম কদিন সন্ন্যাসীরা সিংহাসনে প্রতিমা রেখে পূজো করেছিল, তাই কিছু টের পাওয়া যায় নি। আর শেষদিন গভীর রাতে তারা সিংহাসন থেকে প্রতিমা নামিয়ে রেখেছিল। তাই সকল লোহার জিনিসকে তা প্রবল বলে নিজের দিকে টানছিল। কারণ সে রাতে আমি তিন নম্বর ঘোড়ার পিঠে দুদিকে দুটো বোঝা দেখেছিলাম। একদিকে সেই কালো পাথরের প্রতিমা আর অন্য দিকে সিংহাসন ও অন্যান্য পূজোর সামগ্রী। সিংহাসন ও প্রতিমা আলাদা থাকার কারণেই অমন কান্ডটি ঘটেছিল। তারপর সব লুঠপাট হয়ে গেলে আবার তারা মুর্তিটিকে সিংহাসনের ভেতরে নিয়ে তারা পালিয়েছিল।

শঙ্কর - তা আপনার এই গল্প যে সত্যি তার কোন প্রমান আছে কি?

ডমরুধর - প্রমান নেই? বল কি হে! নিশ্চয় আছে। জানই তো প্রমান ছাড়া আমি কিছু বলি না।

শঙ্কর - কি প্রমান তা শুনি?

ডমরুধর - কেন, সেই চাবির গোছা। এখনও আমার ঘরে আছে। বল তো এখুনি এনে দেখাচ্ছি।

লম্বোদর - হল তো। শঙ্করবাবুর আবার সবেতেই প্রমান চাই। এমন একটা যুত্সই প্রমান পেয়ে একেবারে চুপ মেরে গেলে যে। যাকগে এসব... তা তারপর থেকে আপনার আবাদ একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট, কি বলেন?

ডমরুধর - তা একরকম বলতে পার। শুধু মাঝে একবার ওই এক কুমীর ছাড়া আর কোন ঝামেলা হয় নি?

পবন - কুমীর মানে ?

শঙ্কর – আবার আর একটা আজগুবি গল্প আর কি?

লম্বোদর - সবকিছুর প্রমান পাবার পরও তুমি আজগুলি বল কি করে? আপনি বলুন তো, কুমীরের কি হল?

ডমরুধর - না, কুমীরের কিছু হয় নি। বলছিলাম যে...আমার আবাদের কাছে যত নদীনালা আছে তাতে কি পরিমাণ কুমীর আছে তা তো তোমরা জানই।

পবন - জানবো না আবার, সেই সেবার দাদার জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রায় কুমীরের পেটে যাচ্ছিলাম আরকি। খেজুর গাছের মত নদীতে সব ভেসে বেড়ায় কিংবা পাড়ে উঠে পালে পালে রোদ পোহায়। আর গরুটা, ছাগলটা বাগে পেলেই নিয়ে যায়।

ডমরুধর - ওসব চুনোপুটি কুমীরকে আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আমি যে কুমীরের কথা বলছি তার আবির্ভাব ঘটেছিল আমারই আবাদের কাছে। গন্ধমাদন পর্বতে কালনেমির

পুকুরে যে কুমীর হনুমানকে ধরেছিল, এ তার থেকেও ভয়ানক। গঙ্গাদেবী যে মকরের পিঠে চেপে বায়ুসেবন করেন, এ কুমীর সেই মকরকে একগালে খেতে পারে। পাহাড়প্রমান যে গজ সেকালে বহুদিন ধরে কচ্ছপের সাথে লড়াই করেছিল, সে গজ-কচ্ছপ এ কুমীরের কাছে নস্যি। এর দেহ ছিল তালগাছের মত লম্বা, পেটখানি যেন এই পূজোর দালানের মত বড়। অন্যান্য কুমীরের মত এ জীব-জন্তু ছিড়ে খায় না। এ কুমীর আস্ত গরু, মোষ গিলে ফেলে। এমন কি রাত্রে সে নাকি লোকের ঘরে সিঁদ দিয়ে মানুষ, গরু-বাছুর নিয়ে যেত।

শঙ্কর - সিঁদেল চোরের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন সিঁদেল কুমীরের কথা জীবনে এই প্রথম শুনলাম। তা কুমীর কি করে সিঁদ দিত শুনি?

ডমরুধর - কেন? লেজে করে জল এনে দেয়াল ভিজিয়ে গর্ত করত।

লম্বোদর – মানে ঐ লেজ'ই হল তার সিঁদ!

ডমরুধর – শুধু তাই নয়, এছাড়া'ও লেজের আঘাতে নৌকা ডুবিয়ে যাত্রীদের খেয়ে ফেলা তো আছেই।

পবন –বলেন কি?

ডমরুধর – তাহলে আর বলছি কি---আবাদের আশপাশ দিয়ে নৌকা চলাচল অনেক কমে গেল। সে কুমীরের জ্বালায় আবাদের লোক সব তটস্থ হরে পড়ল।আমার প্রজারা পাছে আবাদ ছেড়ে পালায় সেই চিন্তায় আমিও অস্থির হয়ে পড়লাম।

পবন - তা কি করলেন?

ডমরুধর - একদিন নদীর ধারে বসে কি করে এই কুমীরের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় ভাবছি, এমন সময় কুমীরটি আমার চোখের সামনে একখানা নৌকা উলটে তার যাত্রীদের একে একে গিলে ফেলল। ওই নৌকায় এক ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছিলেন। তার স্ত্রীর সর্বাঙ্গ বহুমুল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আমি তাকেও আস্ত গিলে নিতে দেখলাম।
লম্বোদর – সর্বনাশ!!

ডমরুধর - কুমীরের পেটে মাংস হজম হয় কিন্তু গয়না হয় না। কাজে কাজেই কুমীর যেই তাকে গিলে ফেলল আমার মনে অন্য এক চিন্তার উদয় হল। বরাবর'ই আমার ভাগ্য ভাল যায়; ভাবলাম এই কুমীর যদি মারতে পারি তা হলে তো কুমীরের পেট চিরে ওই গয়নাগুলো বের করতে পারি। আমার অন্তত পাচ-ছ্য় হাজার টাকা লাভ হবে।

লম্বোদর - তা কুমীর মারার জন্য কি বুদ্ধি বার করলেন?

ডমরুধর - আমি স্রেফ কলকাতা চলে গেলাম। বড় একটা জাহাজের নোঙ্গর কিনে উকো ঘষে তাতে ধার দিলাম যাতে তার মুখ তীক্ষ্ণ, ধারাল হয়। এবার যে কাছিতে জাহাজ বাধা থাকে, সেই কাছিও কিনলাম।এসব আয়োজন করে এক সপ্তাহ বাদে আবাদে ফিরলাম। আবাদে এসে শুনি কুমীর আরও এক মানুষ খেয়েছে। চারদিন আগে নাকি এক সাওতালনী এক ঝুড়ি বেগুন মাথায় নিয়ে হাটে বেচতে যাচ্ছিল। সে যেই নদীর ধারে গিয়েছে, কুমীর তাকে ধরে বেগুনের ঝুড়ি সমেত আস্ত গিলে ফেলেছে।ফলে সাওতাল প্রজারাও খেপে উঠেছে, আর বলছে যে আবাদ ছেড়ে তারা আবার দেশে ফিরে যাবে।

পবন - বাবাঃ এ যে বিপদের পর বিপদ দেখছি।

ডমরুধর - আমার অবশ্য এ ঘটনা ঘটাতে বেশ সুবিধাই হয়েছিল। সাওতালগুলোকেও আমার দলে পেয়েছিলাম। যাই হোক আবাদে এসে আমি ওই জাহাজের নোঙ্গরটিকে বড়শি করলাম। তাতে জাহাজের কাছি বেধে দিলাম। লোকে মাছ ধরার জন্য যে হাতসুতো ব্যবহার করে, এও সেই বড় আকারের হাতসুতো হল। নোঙ্গরের তীক্ষ্ণ আগায় এক মোষের বাছুর গেঁথে নদীর জলের কাছে বেধে দিলাম। কাছির অন্য প্রান্ত এক বিশাল মোটা গাছে পাক দিয়ে রাখলাম। আর জনা পঞ্চাশেক লোককে কাছেই লুকিয়ে রাখলাম। বেলা তিনটে নাগাদ আমাদের সব আয়োজন শেষ হল।

লম্বোদর - বলিহারি বুদ্ধি আপনার।

ডমরুধর - তা বাছুর গেঁথেছিলাম বটে, কিন্তু তাকে একবারে প্রানে মারি নি। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সে গাঁ গাঁ করে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে বিকেলের দিকে সেই প্রকান্ড কুমীর এসে উপস্থিত হল। তার লেজের ঝাপটায় পর্বতের মত উচু উচু ঢেউ উঠল। সেই ঢেউয়ে বাছুরটি ডুবে গেল, আর আমরা কিছু দেখতে পেলাম না। পরক্ষণেই কাছিতে টান লাগল।তখন আমরা বুঝলাম যে সেই নোঙ্গরবিদ্ধ বাছুরকে কুমীর গিলেছে, আর সেই নোঙ্গর বড়শির মত কুমীরের গালে বিধেছে।

সবাই- তারপর?

ডমরুধর -তাড়াতাড়ি সেই পঞ্চাশজন লোক এসে দড়ি ধরে টানতে লাগল। ভাগ্যিস মোটা গাছে পাক দিয়ে রেখেছিলাম, না হলে কুমীরের টানে ওই পঞ্চাশজন লোক জলে গিয়ে পড়ত। আমরা সেই রাক্ষস কুমীরকে বড়শিতে গেঁথেছি শুনে চারপাশের অন্য আবাদ থেকে লোক দৌড়ে এল। তারাও ভাবগতিক দেখে দড়িতে হাত লাগাল। তা প্রায় শপাঁচেক লোক দড়ি ধরে টানতে লাগল।

পবন - এত লোক?

ডমরুধর – হ্যাঁ...কখনও ভয় হল এই বুঝি দড়ি ছিড়ে গেল কিংবা নোঙ্গর ভেঙ্গে গেল। আবার কখনও ভয় হতে লাগল গাছ না উপড়ে গিয়ে নদীতে পড়ে। নিশ্চয়ই কিছু না কিছু হত যদি না সাওতালরা এসে ক্রমাগত তীর চালাত, আর যদি না পাশের দুটো আবাদের লোক বন্দুক এনে কুমীরের মাথায় গুলি চালাত। তীর ও গুলি খেয়ে কুমীর মাঝে মাঝে জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু নিঃশ্বাস নেবার জন্য ভেসে উঠলেই আবার তীর ও গুলি চলতে লাগল। কুমীরের রক্তে নদীর জল বহুদুর পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। এরকম করে সারারাত কুমীরের সাথে আমাদের লড়াই চলল। সকালের দিকে কুমীর খানিকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। বেলা নটা নাগাদ ধীরে ধীরে কুমীরের মৃতদেহ জলের নীচে তলিয়ে গেল। তখন অতি কষ্টে তাকে টেনে ডাঙ্গায় তোলা হল।

লম্বোদর - তারপর পেট কেটে গয়না উদ্ধার করলেন বুঝি?

ডমরুধর - সেই কুমীরের পেট কাটতে গিয়েও আরেক বিপদ। বড় বড় ছোরা, কাস্তে এনে তার পেট কাটার সকল চেষ্টা বিফলে গেল। কারণ তার চামড়া ছিল ভীষণ শক্ত। উলটে অস্ত্রগুলোই ভেঙ্গে গেল। শেষে মোটা গাছ কাটা করাত এনে তার পেট কাটতে হল। কিন্তু পেট কেটে যে তার ভিতর যা দেখলাম, তা দেখেই আমার চক্ষুস্থির।

পবন ও লম্বোদর - কি দেখলেন?

ডমরুধর - বলব কি ভাই, সে অতি দুঃখের কথা। দেখি সেই সাওতাল মেয়ে, মানে যাকে এই রাক্ষুসে কুমীর চারদিন আগে গিলেছিল, সে ওই ভদ্রমহিলার সকল দামী গয়নাগুলো নিজের গায়ে পরেছে, তারপর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি উপুড় করে বেগুনগুলোকে সামনে ডাই করে রেখেছে। আর নিজে সেই ঝুড়ির উপর বসে বেগুন বেচছে।

শঙ্কর - (বিস্ময়ের সাথে) কুমীরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসে বেগুন বেচছে?

ডমরুধর - তাহলে আর বলছি কি? কুমীরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসে বেগুন বেচছে।

শঙ্কর - তা কাকে বেগুনটা বেচছিল শুনি? কুমীরের পেটের মধ্যে সে খদ্দেরই বা পেল কোথা থেকে?

ডমরুধর - তোমার ওই এক কথা। সমস্ত গয়নাগুলো ওই সাওতাল মেয়ে গায়ে পরে আছে দেখেই আমার হাড় জ্বলে গেছিল। কাজেই তখন কাকে সে বেগুন বেচছিল সে খোঁজ করার সময় আমার ছিল না। আমি তাকে বললাম-'এই মেয়ে, ওসব গয়না আমার। আমি অনেক টাকা খরচ করে এ কুমীর মেরেছি, ও গয়না খুলে দে'। ব্যস আর যাব কোথায়। কেউ মেউ করে সে মেয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল। আর তার ছেলেরা, জ্ঞাতি-ভাইয়েরা সকলে আমাকে বাঁশ আর লাঠীসোটা নিয়ে মারতে এল। আমার প্রজাগণ বা উপস্থিত কেউই আমার পক্ষ নিল না। সুতরাং আমাকেই চেপে যেতে হল।

লম্বোদর - তাহলে এ যাত্রায় আপনার আর লাভ হল না, কি বলেন।

ডমরুধর - তা বটে। সাওতালরা সেই মেয়েকে নিয়ে ঘরে গেল। দিনকয়েক শুয়োর মেরে আর মদ খেয়ে তারা খুব মজা মারলে। মাঝখান থেকে আমার অনেকগুলো টাকা জলে গেল। মনে মনে বুঝলাম যে আমার মত ভাগ্যবানেরও কপাল খারাপ যায় কখনো।

শঙ্কর - এতো আজগুবি গল্প আপনি পান কোথায় বলুন দেখি?

ডমরুধর - যা বাবা! এতক্ষণ তো বেশ হাঁ করে এক মনে এক ধ্যানে গল্পটি শুনছিলে। যেই গল্প শেষ হয়ে গেল, অমনি এখন বলছ আজগুবি। কলির ধর্ম বটে।

শঙ্কর - এ কুমীরের গল্প যে সত্যি তার কোন প্রমান আছে?

ডমরুধর - প্রমান? নিশ্চয় প্রমান আছে। কোমরের ব্যথার জন্য সে কুমীরের দাঁত আমি ঘুনসিতে পরেছি। এ...এ...এই দেখ।

শঙ্কর - একি? এতটুকু দাত? এ যে বিড়ালের দাতের থেকেও ছোট। আপনি যে বললেন সে কুমীর তালগাছের থেকেও বড় ছিল, তবে তার দাত এত ছোট কেন?

ডমরুধর - অনেক মানুষ খেয়ে খেয়ে সে কুমীরের দাত ক্ষয়ে গিয়েছিল। নাও, ওঠো দেখি....ওঠো, ওদিকে পুরুতমশায় আবার পূজো শুরু করে দিলেন। আমার আবার অনেক কাজ... যাই দেখিগে...গঙ্গাজলটা আবার কোথায়... (গলার স্বর ক্রমে মিলিয়ে যায়)।

সমাপ্ত